বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

নিতাই বসু

গ্রন্থতীর্থ
GRANTHA TIRTHA CALCUTTA
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

এক	পটভূমি কম্পমান	৭
দুই	অগ্নিস্ফুলিঙ্গ — মহারাষ্ট্র থেকে বাংলায়	১৭
তিন	আগ্নেয়ভূমি মেদিনীপুর	৪৩
চার	অগ্নিশিশুর আবির্ভাব	৫১
পাঁচ	বিপ্লবের অগ্নিস্পর্শ ঘটল ক্ষুদিরামের	৬৭
ছয়	বিপ্লব-মন্ত্রে পূর্ণ দীক্ষার লগ্ন	৭৮
সাত	বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ	৯৪
আট	শেষ বিচার	১১০
নয়	অন্তিম লগ্ন	১৩৪
	ক্ষুদিরামের জীবনপঞ্জি	১৪৩

॥ এক ॥

পটভূমি কম্পমান

বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা ভারতকেন্দ্রিক যে-ভাবমণ্ডলে বিরাজ করতেন তা সৃষ্টি করেছিলেন তিনজন — বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ। ইংরেজভক্তির আতিশয্য ও সহযোগিতার সীমিত সুফল নরম-পন্থীদের দাবিকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের বাইরে যেতে দেয়নি। কিন্তু শিল্পসংহার, গণদারিদ্র্য, সম্পদ-নিষ্কাশন, জাতিবৈর ও আমলাতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য নতুন প্রজন্মকে প্রণোদিত করে জাতীয়তাবাদের উগ্রতর আদর্শ-সন্ধানে। আর্য জীবনচর্যার পৌরুষ, ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের ধর্মযুদ্ধ, স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠায় শিবাজীর বিস্ময়কর সাফল্য, বঙ্কিমের অমর মাতৃমন্ত্র, বিবেকানন্দের অভয় আত্মবলিদানের আহ্বান — সব মিলে তৈরি হয় চরমপন্থীর অগ্নিগর্ভ মানসিক জগৎ।

আদর্শ ও চিন্তার রাজ্যে চরমপন্থীদের অল্পবিস্তর ঋণ ছিল বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দের কাছে। তবে তাঁদের আন্দোলনের প্রধান উৎস অন্যত্র নিহিত ছিল। সমসাময়িক কালের নরমপন্থী

মতাদর্শের বিরুদ্ধেই মূলত চরমপন্থী আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের যে-মূল্যায়ন নরমপন্থীরা করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই অগভীর। শুধুমাত্র আবেদন, নিবেদন, প্রাণহীন সভাসমিতির সাহায্যেই বিদেশি শাসকদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব সুযোগ-সুবিধা লাভের চেষ্টায় তাঁরা সীমাবদ্ধ ছিলেন। ইংরেজদের সুবিচারে তাঁদের গভীর আস্থা ছিল। তাই তাঁরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান দাবি করেননি, তাঁদের লক্ষ্য ছিল শাসনব্যবস্থার পরিমার্জনা করা। ছাত্রাবস্থায় ইংলন্ডের ইতিহাস-পাঠ আর আদালত-কক্ষে ব্রিটিশ আইনের ব্যবহার তাঁদের বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে নিয়ে গিয়েছিল।

তা ছাড়া শ্রেণি হিসেবে ইংরেজ রাজত্বের দ্বারা বহুবিধভাবে উপকৃত হওয়ায় তাঁদের আনুগত্যে কোনো আঁচড় পড়েনি। সরকারের নানা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি, ইংরেজদের ন্যায়পরায়ণতা, পক্ষপাতহীনতা এবং উদারতা সম্পর্কে তাঁদের নিঃসংশয় করে তুলেছিল। স্বাধিকার অর্জনের দাবিটা অনুক্ত থেকেই গিয়েছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে সংস্কারের পক্ষপাতী নরমপন্থীরা রাজনীতির ক্ষেত্রেও ছিলেন অতি-সতর্ক সংস্কারপন্থী।

এঁদের অধিকাংশ প্রস্তাবই যে যুক্তিসঙ্গত এবং পরিমিত তা স্বয়ং লর্ড ল্যান্সডাউনও অস্বীকার করেননি। ১৮৯১ সালে তিনি বলেছিলেন যে নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদনের বিষয়গুলি সরকারও কোনো না কোনো সময়ে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করেছেন। লর্ড এলগিন জানতেন যে ফিরোজ শা মেহতার মতো নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবের ভয় নেই। অভিজ্ঞ কংগ্রেসিদের আইনপরিষদে নেবার কথাও বলেন তিনি। সন্দিগ্ধমনা লর্ড জর্জ হ্যামিলটনের স্বীকৃতিও স্মরণযোগ্য : 'কংগ্রেস-আন্দোলন, ইংরেজ শাসন নয়, ইঙ্গ-ভারতীয় আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশীয় জনমতের একটা ক্রুদ্ধ আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে নরমপন্থীরা তাঁদের পাশে 'মহানুভব ইংরেজ জাতির উপস্থিতি' আশা করেছিলেন। তাঁদের চোখে ইংরেজদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল মানব-প্রতিভার মহত্তম অবদান এবং ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে স্বাধীনতার এই উত্তরাধিকারের অংশলাভের আশা যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়েছিল। দাদাভাই নৌরজী বারবার ভারতে প্রচারিত ইংলন্ডের সনদগুলির শরণ নিতেন। ইংরেজদের দায়িত্ব সম্পর্কে বার্ক অথবা ব্রাইট, মেকলে এবং মনরো যেসব উক্তি করেছিলেন, সেগুলোর উপর আস্থা রেখেই নরমপন্থীদের আন্দোলন পরিচালনার উপদেশ দিতেন তিনি। ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের হিতসাধনকে পরম কর্তব্যজ্ঞান করেন সে বিষয়ে এই অগ্রগণ্য নরমপন্থী নেতার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই, তিনি বলেছিলেন, 'সদা-ব্যস্ত ব্রিটিশ জাতির কাছে আমরা যদি বলিষ্ঠ কণ্ঠে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে পারি তবে তা নিশ্চয় বিফলে যাবে না।'

কংগ্রেস ছিল একদিকে ভারতবর্ষের আমলাশাহীর শিকার, অন্যদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উদারনীতির গণতন্ত্রের হাতে প্রতারিত। সিভিলিয়ানদের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টার পর নরমপন্থীরা সরাসরি ব্রিটিশ জাতির কাছে আবেদন নিবেদন আরম্ভ করেন। কিন্তু এতেও বিশেষ লাভ হয়নি। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-হিতৈষী এবং র‍্যাডিক্যাল সদস্যরা ইংরেজ প্রশাসকদের ঔদাসীন্য, কুটিলতা ও হৃদয়হীনতার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু জনমতের উপর তার প্রায় কোনো প্রভাবই পড়েনি।

কিন্তু পরিস্থিতি দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় শাসন আসমুদ্র-হিমাচলে ভারতবাসীকে দাস-জাতিরূপে চিহ্নিত করে ফেলেছিল। মহারানি ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে নাকি সূর্য অস্ত যায় না। সে-সাম্রাজ্য অক্ষয়,অনড়, অন্তহীন। ভারতবাসী সে-সাম্রাজ্যরই প্রভুভক্ত প্রজা। প্রভুর কল্যাণে তার কল্যাণ, প্রভুর সুখ ও সম্পদের জন্য তার বেঁচে থাকার সার্থকতা। দাসত্বের

এ বন্ধনে বুঝি কোথাও ফাঁক নেই। কিন্তু 'শিবাজীর মহারাষ্ট্র' সেদিনও যে স্বাধীন ছিল। কাজেই মারাঠার মন ইংরেজের অধীনতা সহজে মেনে নিতে পারছিল না। ১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের নৃশংসতা আপাত-দৃষ্টিতে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ভারতবর্ষের পথে-প্রান্তরে ভারতীয় বিদ্রোহী চিত্ত গুমরে মরছিল। মাঝে মাঝে তার প্রকাশের চেষ্টা দেখা গিয়েছে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র পন্থায় পাঞ্জাবের কুকা বিক্ষোভে, মনিপুর-উত্থানে, মুন্ডা-অভিযানে, ওহাবী আন্দোলন অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নানা অভ্যুত্থানে। কখনও ব্যক্তিক বিদ্রোহও দেখা গেছে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহারাজা নন্দকুমার একা দাঁড়িয়ে ফাঁসির রজ্জু সানন্দে বরণ করেছিলেন এই বাংলায়। তার গুরুত্ব ছিল সুদূরপ্রসারী। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' রচনা করলেন। মন্ত্রদাতা ঋষির কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারণ করলেন 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্ম-প্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন।

কিন্তু মহারাষ্ট্রের কথা আলাদা। সেখানকার জনসাধারণ তখনও অদূর অতীতের গৌরব স্পর্শ করে স্বাধীনতার স্বাদ স্মরণে রেখেছিল। তারা তখনও ভুলে যায়নি তাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তা নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপীকে। তাছাড়া পর্বতে, গিরিকন্দরে, অরণ্যে ও বন্ধুর প্রান্তরে সশস্ত্র মারাঠা-তরুণদের অশান্ত জীবনযাত্রায় রোমাঞ্চ লেগে থাকত। হয়তো অনেকের উপজীবিকা খেত-খামার থাকলেও অনেকাংশ নির্ভর করত দস্যুবৃত্তির ওপর। এর মূলে আর্থিক প্রয়োজন অপেক্ষা শৌর্যময় অ্যাডভেঞ্চারিজম্-ই ছিল অধিক। সুতরাং সামরিক জাতি এই মারাঠা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না তার সামরিক পরাজয়।

এমন সময় এগিয়ে এলেন একটি তরুণ। বাসুদেব বলবন্ত ফাড়্কে। চোখে তার স্বপ্ন। বাহুতে তার অমিত শক্তি। দেশাত্মবোধে তাঁর হৃদয় ভরপুর। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা হল শিবাজী মহারাজের

সমরকৌশল অনুসরণ করে মহারাষ্ট্রের অশান্ত তরুণদলকে নিয়ন্ত্রিত করা। তিনি গোপনে প্রচার করে চললেন যে, তরুণদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে, সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা বিদেশির হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তুলে দিতে হবে দেশবাসীর হাতে। সেই শুভলগ্নের আর দেরি নেই।

ফাড্‌কে ক্রমশ সৈন্যদল গড়ে তুললেন মহারাষ্ট্রের পার্বত্য উপজাতিগুলোর যুবকদের নিয়ে। তাঁর বিদ্রোহীবাহিনী ইংরেজ-শাসনকে নানাক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে তুলল। রাজনৈতিক কারণে তাঁর দল অনেক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে পুলিশের অভিমত। মুম্বাই প্রদেশের গভর্নর রিচার্ড টেম্পল্‌কে হত্যার জন্য ফাড্‌কে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে দিলেন।

মোটের উপর ফাড্‌কে ও তাঁর বাহিনী ইংরেজ-রাজপুরুষদের চোখের ঘুম কেড়ে নিলেন। তাই মহারাষ্ট্রের নর-নারী তাঁকে 'দ্বিতীয় শিবাজী' রূপে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল। এইভাবে কেটে গেল কয়েক বছর।

১৮৭৯ সালের ৩ জুলাই দুর্দৈব নেমে এল। হায়দরাবাদ জেলায় কালাদ্‌গির মন্দিরে বলবন্ত ফাড্‌কে গ্রেপ্তার হলেন। মারাঠী-শৌর্যশিখার দুর্জয় প্রকাশ এবার স্তিমিত হল।

বিচারে ফাড্‌কে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড লাভ করলেন। তরুণ বীরকে শৃঙ্খল পরিয়ে পাঠানো হল ভারতের বাইরে সুদূর এডেন বন্দরের নির্জন কারাকক্ষে। সেখানে দৈহিক অত্যাচারের অন্ত ছিল না। কিন্তু মন তাঁর কখনও ভাঙেনি। পরমপ্রাপ্তি যে তাঁর ঘটে গেছে। দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করার তপস্যায় তিনি আপন অঙ্গে শৃঙ্খল ধারণ করেছেন। এর অধিক কামনা তাঁর নেই।

কিন্তু অসহ্য নিপীড়নে তাঁর দেহ ভেঙে গেল। চিকিৎসার কোনো সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। তাই ভারতবর্ষের মুক্তিপিপাসু এই যোদ্ধা ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আত্মীয়-বন্ধু ও দেশবাসীহীন অবস্থায় বহির্ভারতের অন্ধকার এক কারা-কক্ষে দেহত্যাগ করলেন।